অভিবাসন ও জুয়া

সৈয়দা রোযানা রশীদ

এই লেখাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈয়দা রোযানা রশিদের *'আনসার্টেইন টুমরো : লাইভলিহুডস, ক্যাপিটাল অ্যান্ড রিস্কস ইন লেবার মাইগ্রেশন ফ্রম বাংলাদেশ'* (ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬) গ্রন্থের 'দ্য গ্যাম্বেল' অধ্যায়ের আংশিক অনুবাদ। ২০০৫ ও ২০০৬ সালে পিএইচডি গবেষণার অংশ হিসেবে রোজানা রশিদ যখন কুমিল্লার দুটি গ্রামের মানুষদের অভিবাসনের কার্যকারণ বোঝাপড়ার কাজটি করছিলেন, তখনও প্রচার করা হত বাংলাদেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। কথিত এই উন্নয়নের জোয়ারের মধ্যেও কেন বাংলাদেশের গ্রামবাংলার শ্রমজীবী মানুষ অভিবাসী হয় তা উঠে এসেছে এই গবেষণায়। তখনকার মত এখনও ফোর লেইন আর ফ্লাইওভারকেন্দ্রিক উন্নয়নের ডামাডোলের মধ্যেও মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে এমনকি নৌকায় করে সাগর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের তরুণরা মালয়েশিয়া কিংবা ইউরোপ যাওয়ার চেষ্টা করছে। ২০০৫-০৬ সালের তুলনায় টাকার অঙ্কে জিডিপি কিংবা মাথাপিছু আয় বাড়লেও মৌলিক কাঠামোগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও বাংলাদেশের তরুণ শ্রমজীবীরা কেন অভিবাসন নামের এই জুয়া খেলায় নিয়োজিত হচ্ছে, তার বোঝাপড়া করতে লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। *সবর্জনকথার* জন্য এই অধ্যায় অনুবাদ করেছেন **কল্লোল মোস্তফা**।

অভিবাসন প্রসঙ্গে অনেক সময়ই মানুষকে বলতে শোনা যায়, "বিদেশে গেলে ঝুঁকি থাকবই, কিন্তু ঝুঁকি না নিলে আগামু কেমনে?" এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, অভিবাসনে যে ঝুঁকি আছে, তা মানুষ ভাল করেই জানে। কিন্তু এর মাধ্যমে লাভের সুযোগও তারা দেখতে পায়। আরেকভাবে বললে, বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন ও জীবিকার মাঝে এমন আরও অনেক ঝুঁকি আছে, যার ফলে অভিবাসনকে তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়।

মানুষের জীবন-জীবিকার দিকে ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যায়, যদিও জমি এক ধরনের নিরাপত্তা দেয়, তবু কৃষিকাজ অভিবাসনের চেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কৃষিকাজে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা অনেক বেশি। আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার কারণে কোন ফসল এক বছর ভাল হলেও তার পরের বছর হয়ত বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। বীজ ও সেচ ব্যবস্থা কারিগরিভাবে আগের চেয়ে উন্নত হলেও এই বৃষ্টিবহুল বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষিকাজে ঝুঁকি হল দৈনন্দিন বাস্তবতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও ঝুঁকির হিসাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়টিও আমলে নিতে হবে। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে আজও এমন কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি, যেখানে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা থাকে।

ফলে স্থানীয় জীবনযাপনের ধরনের ওপর ভিত্তি করে যদি দুনিয়া সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, তাহলে গ্রামবাংলার মানুষের কাছে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঝুঁকির তুলনায় অভিবাসনের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিকে কম ভয়ংকর মনে হতেই পারে। তাদের কাছে বিদেশের তুলনায় দেশের জীবন অনেক বেশি অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ। আমার কাছে মনে হয়, ঝুঁকি সম্পর্কিত এই ধারণার কারণেই দরিদ্র পশ্চাৎপদ ও অনিরাপদ বাংলাদেশের বিপরীতে নিরাপদ, সুযোগ-সুবিধায় পূর্ণ ও অগ্রসর এক বিদেশ সম্পর্কিত জনপ্রিয় ধারণাটি গড়ে উঠেছে।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ এবং সেগুলো সম্পর্কে গ্রামের মানুষ কী ভাবে তা খতিয়ে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। কাজের অন্যান্য সুযোগের তুলনায় অভিবাসনের গুরুত্ব বোঝার জন্য প্রথমে আমি স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগগুলো সম্পর্কে খোঁজ নিতে চাই। মনপুর ও ঝুমপুর গ্রামের কিছু মানুষ স্থানীয়ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। স্থানীয় বাজারটি আসবাবপত্র, স্টেশনারি, জামাকাপড় সেলাই, চাল, সিগারেট ইত্যাদি পণ্যের দোকানপাটে ভর্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের এই রমরমা পরিস্থিতির সাথে অভিবাসনের সম্পর্ক রয়েছে। এই দোকানপাটের একটা বড় অংশ বিদেশফেরত মানুষদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। কিছু দোকান এমন সব পরিবার চালায়, যাদের একজন বা দুজন সদস্য বিদেশে অভিবাসী এবং দোকানে পুঁজির সংকট হলে অভিবাসীরা তার জোগান দেয়। অভিবাসনের ফলে নিশ্চিতভাবেই স্থানীয় পরিবারগুলোর হাতে আগের তুলনায় বেশি অর্থপ্রবাহ তৈরি হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু মানুষ আবার নির্মাণসামগ্রী, মসলা কিংবা শাকসবজি বিক্রির মত মৌসুমি ব্যবসায় নিয়োজিত। ব্যবসা যা-ই হোক, তা করতে নগদ অর্থ ও জমিজমার প্রয়োজন হয়; যেমন– মৎস্য খামারের জন্য পুকুর, পোলট্রি কিংবা গবাদি পশু পালনের জন্য জমি ইত্যাদি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে ব্যবসার ঝুঁকি অনেক বেশি। দোকানদাররা অনেক সময় প্রতিবেশীদের বাকিতে পণ্য দিতে দিতে পুঁজি হারিয়ে ফতুর হয়ে যায়। ব্যবসায় মার খেলে ঘুরে দাঁড়ানো আরও কঠিন। নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো ব্যাংক ঋণ পাওয়ার যোগ্য না, আর এনজিওরা ঋণ দেয় একেবারে ভূমিহীন ও হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে। যদি কোন গ্রাহক ব্যবসায় ৮-১০ জন নিয়োজিত করার সামর্থ্য দেখাতে পারে তাহলে প্রধান দুটি এনজিও, গ্রামীণ ও আশা, তাকে সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে। বাস্তবে খুব কম গ্রাহকেরই এ রকম সামর্থ্য থাকে। এনজিওগুলোর দেয়া তথ্য অনুসারে গ্রামে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল পাঁচ হাজার টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, কারণ এই ঋণ পরিশোধ করা তাদের জন্য খুব কঠিন নয়। সকল এনজিওর প্রাথমিক লক্ষ্য হল ভূমিহীন, দরিদ্র ও দুস্থ নারী। যদিও আমি মনপুর ও ঝুমপুরে দেখেছি এসব ঋণ পরোক্ষভাবে পুরুষরাই ব্যবহার করে। তারা রিকশা, মাছ ধরার জাল, ডিম কিংবা মুরগি কিনে ছোটখাট ব্যবসা করে। বেশির ভাগের জন্যই এনজিওর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মাঝারি আকারের পোলট্রি, মৎস্য খামার কিংবা পশু পালন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। মূলত দুটো কারণে এই প্রকল্পগুলোর ব্যর্থতার হার বেশি– মড়ক লাগা এবং এনজিওগুলোর ঋণ আদায়ের কঠোর নিয়ম। আর টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকায় আত্মীয়-স্বজনরা ব্যবসার জন্য সহজে ঋণ দিতে চায় না। সব মিলিয়ে গ্রামগঞ্জে ব্যবসার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়।

এরপর আসে সরকারি চাকরির কথা, যা অভিবাসনের মতই বা তার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়। কয়েক দশক ধরেই পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর, বাংলাদেশ ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, বাখরাবাদ গ্যাস, কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ইত্যাদি স্থানীয় সরকার পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিম্ন স্তরে গ্রামের তুলনামূলক শিক্ষিত অংশটি চাকরি পেয়ে আসছে। মনপুর ও ঝুমপুর গ্রামের প্রথম প্রজন্মের চাকরিজীবীদের একটা অংশ ইতোমধ্যেই অবসর নিয়েছে এবং অনেকে

এখনও অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সুপারভাইজার, অফিস সহকারীসহ বিভিন্ন কেরানির চাকরি করছেন। আমি ১৩টি পরিবারের খোঁজ পেয়েছি, যাদের পরিবারের কোন না কোন সদস্য সামরিক বাহিনীতে চাকরি করেন বা করেছেন। পদমর্যাদা ও কাজের ধরন যা-ই হোক না কেন, সুনিশ্চিত বেতন, চাকরির নিরাপত্তা, পেনশন এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে সরকারি চাকরির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য অনেক বেশি।

গ্রামের মানুষ শ্রমঘন কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক খাতের নিম্ন পর্যায়ের মজুরি শ্রম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও চাকরি করতে আগ্রহী। বাস্তবেই সরকারি চাকরি গ্রামের মানুষদের 'কৃষকের সন্তান' পরিচয়টি মুছে ফেলার সুযোগ করে দেয়, যে পরিচয়ের সাথে দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার ইমেজ বা ভাবমূর্তি যুক্ত। ঔপনিবেশিক আমলে যখন একদল সচ্ছল মধ্যবিত্ত তৈরি হচ্ছিল তখন থেকেই এই ভাবমূর্তির জন্ম। স্বাধীনতার পরেও যে বিপুল আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে সে ক্ষেত্রেও অবকাঠামোগত উন্নয়ন যা হয়েছে তা ঢাকা ও ঢাকার মত বড় বড় শহরকে ঘিরে হয়েছে। একদল নব্য ধনীর জন্ম হয়েছে, যারা সম্পদ ও আয় বণ্টনের এই ধরনটির সুবিধাভোগী। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, গ্রামের প্রথম দিককার চাকরিজীবীরা সরকারি কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন সম্পদ ও পৃষ্ঠপোষকতার নেটওয়ার্কের সাথে খুব ভালভাবে যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে গ্রামে তাদের অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে। যেমন ভূমি অফিসের কেরানি হিসেবে কাজ করা কেউ হয়ত তাঁর গ্রামের লোকদেরকে জমি নিবন্ধনে সাহায্য করেছেন; জনস্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত কেউ হয়ত তাঁর গ্রামকে টিকা বা স্যানিটেশন কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসতে সহায়তা করেছেন। এভাবে বিভিন্ন সরকারি অফিসে কর্মরত মানুষগুলো গ্রামের মানুষের কাছে সরকারি সেবা প্রাপ্তির কমন চ্যানেল বা সাধারণ উপায়ে পরিণত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য কেউ হয়ত সংশ্লিষ্ট অফিসে কাজ করে এমন আত্মীয় বা প্রতিবেশিকে খুঁজে নিয়েছেন, যিনি তাঁর হয়ে দাফতরিক আনুষ্ঠানিকতাগুলো সম্পন্ন করে দেবেন। সবাই বিশ্বাস করেন এতে সময়, অর্থ (ঘুষ) ও শ্রম কম লাগে। এর ফলে সহায়তা গ্রহণকারীর ওপর সহায়তা প্রদানকারীর একধরনের আধিপত্য তৈরি হয়। বাংলাদেশের সরকারি চাকরির মাধ্যমে সরকারি চাকরিজীবীরা বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নিরাপত্তাসহ এক ধরনের প্রতীকী পুঁজির অধিকারী হন এবং এর মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনের কাছে তাঁর মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। এত গুরুত্ব ও চাহিদা থাকার পরও তুলনামূলক কমসংখ্যক কর্মসংস্থানের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে খুব কমসংখ্যক গ্রামবাসীই সরকারি চাকরির সুযোগ পান। তুলনামূলক কম শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রামের মানুষ সাধারণত কারখানা, দোকান বা শহরের ব্যক্তিগত বাসাবাড়িতে কাজ নিতে পারেন, কিন্তু সরকারি চাকরি খুব কম লোকই পান।

ব্যবসা ও চাকরির তুলনায় অভিবাসনের সুযোগ তুলনামূলক বেশি, বিশেষত সেই সব এলাকায় যেখানে অভিবাসীদের নেটওয়ার্ক বিদ্যমান। দাদন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন–সকলেই অভিবাসনের জন্য ঋণ দিতে যতটা আগ্রহী, ব্যবসার জন্য ততটা নয়। এর কারণ হল অভিবাসনের মধ্য দিয়ে ঋণের অর্থ ফিরে পাওয়ার হার তুলনামূলক ভাল। নিজের সঞ্চয় থেকে বা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে নিয়ে বা জমি বিক্রি করে যে অর্থ অভিবাসনে বিনিয়োগ করা হয় তা সাধারণত বছরখানেক বা তার কিছুটা বেশি সময়ের মধ্যেই উঠে আসে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ মনে করে টাকা জমানোর সবচেয়ে সহজ ও দ্রুততর উপায় হল অভিবাসন। বেশ কয়েকটি মাঝারি ও ছোট আকারের অভিবাসী পরিবার জানিয়েছে যে কৃষি উৎপাদন, মজুরি শ্রম, ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা চাকরি থেকে সঞ্চয় করা কঠিন ('টাকা রাখতে পারি না'), কারণ এসব কার্যক্রম থেকে আয় খুব কম, যার সবটুকু তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতেই খরচ হয়ে যায়। দেশের যে কোন আয় থেকে বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থ তুলনামূলক বেশি হওয়ার কারণে অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। দ্রুত ঋণ শোধ করার তাগিদে অভিবাসী শ্রমিকরা বাড়তি কাজ বা ওভারটাইম করেন। কিছু মানুষ দ্বিতীয় একটি চাকরি জোগাড় করেন। যেমন অভিবাসী শ্রমিক শুক্কুর বাহরাইনে একটি দোকানে কাজ করেন এবং দোকান বন্ধ হওয়ার পর খাদ্য সরবরাহের নিজ ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি বলেন, "আমাকে এই কাজটা গোপনে করতে হয়, নইলে আমার চাকরি চলে যেতে পারে। এইটুকু ঝুঁকি না নিলে বিদেশে যাওয়ার কী অর্থ?"

> গ্রামবাংলার মানুষের কাছে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঝুঁকির তুলনায় অভিবাসনের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিকে কম ভয়ংকর মনে হতেই পারে। তাদের কাছে বিদেশের তুলনায় দেশের জীবন অনেক বেশি অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ। আমার কাছে মনে হয়, ঝুঁকি সম্পর্কিত এই ধারণার কারণেই দরিদ্র পশ্চাৎপদ ও অনিরাপদ বাংলাদেশের বিপরীতে নিরাপদ, সুযোগ-সুবিধায় পূর্ণ ও অগ্রসর এক বিদেশ সম্পর্কিত জনপ্রিয় ধারণাটি গড়ে উঠেছে।

এই একটা মন্তব্য থেকে অনেকগুলো বিষয় উঠে আসে। অভিবাসীদের চোখে বিদেশে অর্থ আয়ের অনেক সুযোগ থাকে, যার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা তাদের দায়িত্ব। আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক সময় নিজের কাজের বাইরে অন্য কাজে নিয়োজিত হওয়ার বেলায় বৈধতা ও অবৈধতার সীমারেখা মুছে যায়। শ্রমিক সরবরাহ ও হুন্ডি ব্যবসাকে মনে করা হয় বিদেশে অর্থ উপার্জনের দ্রুততম উপায়। এগুলো অবৈধ কাজ হওয়ার কারণে সব সময়ই জেলে যাওয়া কিংবা সেই দেশ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কিন্তু অভিবাসীরা যে কোন ধরনের পরিণাম মেনে নিতে প্রস্তুত থাকেন। দেশে দারিদ্র্যের গভীরে নিমজ্জিত হওয়ার চেয়ে এটা তাদের কাছে কম ঝুঁকিপূর্ণ।

এর মাধ্যমে বোঝা যায় এক ভিন্ন ধরনের নৈতিকতা ঝুঁকি সম্পর্কে অভিবাসীদের ধারণা ও প্রতিক্রিয়ার ধরন নির্ধারণ করে। অবৈধ ভিসাসহ ধরা পড়লে বা বহিষ্কৃত হলে অভিবাসীরা যতটা অসম্মানিত বোধ করেন তার চেয়ে অনেক বেশি অসম্মানিত বোধ করেন তাঁদের পরিবারকে সাহায্য করতে না পারলে, ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে, ঘরের মেয়েদের বিয়ে দিতে না পারলে কিংবা ঘরের নারীদের অর্থ উপার্জনে নিয়োজিত করতে হলে। রাষ্ট্র এবং বাজার যখন মানুষকে কর্মসংস্থান, পর্যাপ্ত আয় ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, মানুষের কাছে তখন হুন্ডি পাঠিয়ে কিংবা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে আইন ভাঙাকে অবৈধ মনে হয় না। রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ভিন্নতা ও দুর্বল 'নাগরিকত্ব' বোধের কারণে এই মানুষগুলোর কাছে বেআইনি মানেই অনৈতিক নয়। বৈধ হোক বা অবৈধ, মূল উদ্দেশ্য হল ফেলে আসা দেশের বাড়ির মানুষদের জীবনমানের উন্নয়ন। মানুষ বিশ্বাস করে যে অভিবাসনের মাধ্যমে তারা এক পর্যায়ে তাদের ব্যয়ের চেয়ে বেশি সঞ্চয় করতে পারবে।

ফলে সাধারণভাবে আমি এ বিষয়ে বিদ্যমান লেখালেখির সাথে একমত যে অভিবাসন হল একটি ঝুঁকি হ্রাসকারী কৌশল। আমার সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে

অন্তর্নিহিত কতগুলো ঝুঁকি থাকে, যা অভিবাসনের ঝুঁকির চেয়েও বেশি। এ পর্যায়ে আমরা অভিবাসনের ঝুঁকিগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

২. অভিবাসনের ঝুঁকি

অভিবাসনের ঝুঁকি নিয়ে বিদ্যমান লিটারেচারে তিনটি দলের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়–নারী, শিশু ও বৃদ্ধ। ধরে নেয়া হয়, অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে অভিবাসী ও তার পরিবার এক বা একাধিক ধরনের বিপদের মুখে পড়ে। ব্যর্থ অভিবাসনের ফলে পরিবারের শিশুদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যেতে পারে। গৃহস্থালির প্রধান অর্থ উপার্জনকারী ব্যক্তিটি দূরে চলে যাওয়ার কারণে পরিবারটি নানা সমস্যায় পড়তে পারে। দূরত্বের কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টানাপড়েন তৈরি হতে পারে। পুরুষের অভিবাসনের ফলে নারীর শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ঝুঁকি ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সামাজিক-রাজনৈতিক বিপদগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবাসে অভিবাসীদের শোষিত হওয়া, অবৈধ হয়ে যাওয়া এবং কোন ধরনের আইনি সুরক্ষা না পাওয়া। এখানে আমি অভিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ও সেই ঝুঁকি মোকাবেলায় তাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করব।

২.১ জীবনের ঝুঁকি

মনপুর গ্রামের ফাহিম (৩৬) ১৯৯১ সালে বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সরকারি কেরানি, যাঁর সামান্য আয়ে ১০ সদস্যের (৬ পুত্র ও ৩ কন্যা) সংসার চলত না। তাঁর পিতার এক সহকর্মীর সাহায্য নিয়ে ফাহিম ঢাকার এক রিক্রুটিং এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা তাঁর মত আরও ২০ জনসহ আকাশপথে থাইল্যান্ড গেলেন। সে সময় মালয়েশিয়ার কর্মসংস্থান ভিসা জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই রিক্রুটিং এজেন্টরা থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া সীমান্ত হয়ে অবৈধভাবে অভিবাসী শ্রমিক মালয়েশিয়ায় পাঠাত। ফাহিমের ভাষায়, "আমরা ঢাকা থেকে থাই ভিসা নিয়ে থাইল্যান্ড গেলাম। থাইল্যান্ডে আমাদেরকে হাজিব নামের একটা জায়গায় নিয়ে ২২ দিন এক হোটেলে রাখা হল। সেখানে আরেক দল বাংলাদেশির দেখা পেলাম, যারা আমাদের মতই মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের এজেন্ট আমাদের খাবার ব্যবস্থা করত, কিন্তু বাইরে যাওয়া বা লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলার কোন অনুমতি ছিল না। ২৩তম দিনে আমাদেরকে থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া সীমান্তের একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। নিরাপত্তার কড়াকড়ির কারণে সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য সেখানে আমাদেরকে দুই দিন থাকতে হয়েছিল। কাজটা এতটা কষ্টকর হবে আমরা আগে বুঝতে পারিনি।"

ফাহিম তাঁর মত আরও ২৮ জনের সাথে গাদাগাদি করে একটা ভ্যানে উঠতে বাধ্য হলেন। এভাবে সারা দিন চলতে চলতে তাঁরা আর সহ্য করতে পারছিলেন না, তৃষ্ণায় এক পর্যায়ে চিৎকার করতে থাকেন। অবশেষে একটা মসজিদের কাছে ভ্যানটা থামে। "আমরা সবাই দৌড়ে কাছের পুকুরে গিয়ে তৃষ্ণার্ত পশুর মত পানি পান করি। এক ঘণ্টা পর আবার যাত্রা শুরু হয়। কয়েক ঘণ্টা পর ভ্যানটি নদীর ধারে থামে এবং সেখানে তাদের পারাপারের জন্য দুটো নৌকা রাখা ছিল। তাদেরকে দুই দলে ভাগ করা হয়। ফাহিম ছিলেন প্রথম দলের সাথে। তাঁরা কোন বিপদ ছাড়াই নদী পার হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় নৌকা নদীতে নামার সাথে সাথে ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ঢলে ফাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের চোখের সামনে তাদের সমস্ত মালামাল ভেসে গেল; যদিও তাঁরা কোনভাবে বেঁচে গেলেন। এই অবস্থায় তাঁদেরকে কুয়ালালামপুরের এক রিক্রুটিং এজেন্টের কাছে আশ্রয় ও চাকরির জন্য নিয়ে যাওয়া হল। সে সময় তাঁদের কাছে পাসপোর্ট ও পরিধেয় জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। স্থানীয় এজেন্ট তাঁদেরকে একটা আশ্রয়ে পাঠাল, যেখানে তাঁরা আরও কিছু বাংলাদেশির দেখা পেলেন। পরের দিন তাঁদেরকে আবারও সেই এজেন্টের অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। মালয়েশিয়ার নিয়োগকর্তারা সাধারণত এসব অফিসে এসে তাদের পছন্দ অনুযায়ী শ্রমিক সংগ্রহ করত। এক কোম্পানি কয়েকজন ইলেকট্রিশিয়ান খুঁজছিল। ফাহিম ও আরও দুজন হাত তুললেন। ফাহিম খুশি মনে ওই কোম্পানিতে দেড় বছর কাজ করেছিলেন। কোম্পানি তাঁকে আবাসন ও খাবার জায়গার ব্যবস্থা করে দিলেও রিক্রুটিং এজেন্ট তাঁকে কর্মসংস্থানের জন্য বৈধ কাগজপত্র দিতে পারল না। এ সময় মালয়েশিয়ার সরকার অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী বিষয়ে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করলে তাঁর কোম্পানি তাঁকে কাজটা ছেড়ে দিতে বলে। শুরু হল আরেকটি চাকরির সন্ধান। অন্যান্য প্রবাসী বাংলাদেশির সহায়তায় ফাহিম আরেকটি কারখানায় কাজ পেলেন। সেখানি তিনি এক বছর কাজ করলেন, কিন্তু সেখানকার মজুরি সন্তোষজনক ছিল না। তা ছাড়া অন্যান্য বাংলাদেশি সহকর্মীদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন, সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে এখান থেকেও তাঁদের ছাঁটাই করা হবে। ফাহিম চাকরি ছাড়লেন, কিন্তু ওই কারখানায়ই থাকতে লাগলেন। এক পর্যায়ে কারখানার মালিক পুলিশ ডেকে তাঁদের ধরিয়ে দিল। "সেই দিনগুলো ভীষণ হতাশার ও দুর্বিষহ ছিল। জেলের মধ্যে প্রায়ই আমি কাঁদতাম এই কথা চিন্তা করে যে বিদেশে এসে যে শুধু আমার পিতার কঠোর শ্রমে অর্জিত অর্থই অপচয় হয়েছে তা নয়, আমার নিজের জীবনটাও নষ্ট হচ্ছে। জেল থেকে বের হওয়ার জন্য সাহায্য চেয়ে আমি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতাম। আল্লাহ আমার কথা শুনলেন। ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়া সরকার সকল অবৈধ বাংলাদেশি শ্রমিকের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করল। বহু মালয়েশীয় কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের শ্রমঘন কাজের জন্য জেলের মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিক খুঁজতে শুরু করলেন। এ রকমই একটা কোম্পানি নির্মাণকাজের জন্য আমাকে পছন্দ করল। তারা আমার জন্য নতুন পাসপোর্টসহ বৈধ কাগজপত্রেরও ব্যবস্থা করল। আমার মনে হল আমি নতুন জীবন পেয়েছি।" এভাবে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কয়েক বছর কাজ করার পর পর্যাপ্ত মজুরি না পাওয়ার কারণে ফাহিম চাকরি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর পাসপোর্ট ওই কোম্পানির কাছেই রয়ে গেল। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আরেকটি পাসপোর্ট জোগাড় করে তুলনামূলক ভাল মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ফাহিম একটা পোলট্রি কারখানায় যোগ দিলেন। এখানে কয়েক বছর কাজ করার পর পদোন্নতি পেয়ে তিনি সুপারভাইজার হলেন। তুলনামূলক বড় একটি থাকার জায়গা, মোবাইল ফোন ও সবেতন ছুটি পেলেন তিনি। এখন তিনি খুশি যে বহু বছরের কঠোর সংগ্রামের পর অবশেষে তিনি মালয়েশিয়ায় একটা স্থায়ী জায়গা

> বেশির ভাগের জন্যই এনজিওর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মাঝারি আকারের পোলট্রি, মৎস্য খামার কিংবা পশু পালন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। মূলত দুটো কারণে এই প্রকল্পগুলোর ব্যর্থতার হার বেশি–মড়ক লাগা এবং এনজিওগুলোর ঋণ আদায়ের কঠোর নিয়ম। আর টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকায় আত্মীয়-স্বজনরা ব্যবসার জন্য সহজে ঋণ দিতে চায় না। সব মিলিয়ে গ্রামগঞ্জে ব্যবসার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়।

খুঁজে পেয়েছেন। ফাহিম তাঁর এক ভাইকেও মালয়েশিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যে সেখানে তিন বছর কাজ করেছে। তিনি তাঁর অন্য ভাইদেরও মধ্যপ্রাচ্যে পাঠাতে অর্থ প্রদান করেছেন।

গন্তব্য যা-ই হোক, প্রায় সকল অনিয়মিত অভিবাসী শ্রমিককেই ফাহিমের মত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ইউরোপ গমনেচ্ছুদের ঝুঁকি আরও বেশি। ২০০৫ সালের মার্চ মাসে অবৈধভাবে স্পেনে প্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে ১০ জন বাংলাদেশি তরুণ ভূমধ্যসাগরে ডুবে মরে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নৌকা মাঝসাগরে থেমে যায়। যখন উদ্ধার করা হয় তত দিনে ৩০ জন যাত্রীর মধ্যে ১০ জন ক্ষুধা ও ঠাণ্ডায় মারা গেছে। ২০০৫ সালের এপ্রিলে অবৈধভাবে গ্রিসে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে বঙ্গোপসাগর থেকে ৯০ জনকে আটক করা হয়।

নিয়োগকর্তাদের হাতে অভিবাসী শ্রমিকদের শোষিত হওয়ার তথ্য আমি সরাসরি সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের অমানবিক জীবন ও কাজের পরিবেশ নিয়ে অসংখ্য রিপোর্ট বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, বাস্তব পরিস্থিতি এই সব রিপোর্টের বর্ণনার চেয়ে আরও জটিল ও বিপজ্জনক। তাদের কথা অনুসারে, বিপুলসংখ্যক শ্রমিক এক তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বৈদেশিক শ্রমবাজারে শোষণমূলক শর্তে কর্মে নিয়োজিত হন, যেখানে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও বেতন প্রদান না করার মত ঘটনা অভিবাসী শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা। সকলের সহ্য ক্ষমতা এক রকম নয়, ফলে অনেকেই নিয়োগকর্তাদের কাছে জমা থাকা পাসপোর্ট ফেলে রেখেই কাজ ছেড়ে দেন। যে মুহূর্তে কোন অভিবাসী শ্রমিক তাঁর কাজ ছাড়েন, তখন থেকেই তিনি হয়ে যান 'অবৈধ', যাকে যখন খুশি গ্রেফতার, আটক বা বহিষ্কার করা যায়।

ফাহিমের ঘটনা থেকে আরও দেখা যায় এই সব বিপদের মধ্যে যোগাযোগের নেটওয়ার্ক বা সামাজিক পুঁজি কীভাবে কাজে লাগে। অবৈধ শ্রমিকরা অনেক সময় প্রবাসে থাকা আত্মীয়-স্বজনের কাছে চাকরি ও আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ফাহিমের ঘটনা থেকে দেখা যায়, বিদেশে গেলে মানুষের সামাজিক যোগাযোগ বাড়ে। কুয়ালালামপুরে যে বাংলাদেশিদের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল, চাকরি হারানোর পর তাঁরাই তাঁকে আরেকটি চাকরি খুঁজে পেতে সাহায্য করেন।

২.২ দেশের বাড়িতে জীবিকার ঝুঁকি

গন্তব্য ও তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই অনেককে অভিবাসনের জন্য অর্থ প্রদান করে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এর ফলে তাঁর বিদ্যমান জীবিকাটিও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। ফারাজের উদাহরণটি দেখা যাক :

ফারাজ (৪৫) বহুদিন ধরে তাঁর মালয়েশিয়া যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ছোট ভাই সাকিফ (৪২) মালয়েশিয়া থেকে তাঁর জন্য একটা ভিসা পাঠাবেন বলে জানান। ফারাজের তিনটি রিকশা ছিল, যেগুলো ভাড়া দিয়ে তিনি তাঁর দৈনন্দিন খরচ মেটাতেন। বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজনে তিনি তাঁর রিকশাগুলো বেচে দিলেন, যার ফলে তাঁর পারিবারিক আয় কমে গেল। ফারাজ ভেবেছিলেন তিনি শিগগিরই বিদেশে গিয়ে বাড়ির জন্য টাকা পাঠাতে পারবেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর যাওয়ার দিন-তারিখ নিশ্চিত নয়, তাই জীবিকার তাগিদে তাঁদেরকে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার দেনা করতে হল। এভাবে এক বছর পার হওয়ার পর সাকিফ জানালেন, তাঁর ভাইয়ের ভিসা কেনার জন্য তিনি নির্ভরযোগ্য কোন দালালের সন্ধান পাননি। ওই টাকা দিয়ে অবশেষে ফারাজ ট্যুরিস্ট ভিসায় সিঙ্গাপুর যাত্রা করেন। যাওয়ার আগে তিনি আমাকে বলেন, "আমি এর আগে পাঁচ বছর মালয়েশিয়ায় ছিলাম। আমি নিজেই নিজের দেখভাল করতে জানি। আমি সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার সীমান্ত দিয়ে মালয়েশিয়া প্রবেশের চেষ্টা করব।"

জীবিকার আরেক ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয় যখন অভিবাসী শ্রমিকের পরিবার শুধু বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মাঠগবেষণার সময় আমি অনেক পরিবারকে দেনার চক্রে আটকে পড়তে দেখেছি, কারণ বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠানোর ব্যাপারটি নিয়মিত ও সুনিশ্চিত থাকে না। ঋণ পরিশোধ করার আগেই মানুষ একই বা অন্য ঋণ প্রদানকারীর কাছ থেকে ধার করে। অভিবাসী শ্রমিক দুর্ঘটনায় পড়লে, অসুস্থ হলে বা নিহত হলে তাঁর পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল পরিবারটি নিদারুণ সংকটে পড়ে যায়। বিষয়টি বোঝার জন্য নিচের উদাহরণটি দেখা যাক :

> বেশ কয়েকটি মাঝারি ও ছোট আকারের অভিবাসী পরিবার জানিয়েছে যে কৃষি উৎপাদন, মজুরি শ্রম, ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা চাকরি থেকে সঞ্চয় করা কঠিন ('টাকা রাখতে পারি না'), কারণ এসব কার্যক্রম থেকে আয় খুব কম, যার সবটুকু তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতেই খরচ হয়ে যায়। দেশের যে কোন আয় থেকে বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থ তুলনামূলক বেশি হওয়ার কারণে অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। দ্রুত ঋণ শোধ করার তাগিদে অভিবাসী শ্রমিকরা বাড়তি কাজ বা ওভারটাইম করেন।

মনপুর গ্রামের তাজুল (৩৪) ১৯৯৪ সালে পিতা-মাতা, স্ত্রী, দুটি সন্তান ও একজন অবিবাহিত ভাই আলমকে (২৫) রেখে সিঙ্গাপুর যান। তিনি ২০০০ সালে আলমের জন্য একটি ভিসা পাঠাতে সক্ষম হন। দুজন সক্ষম মানুষ বিদেশ চলে যাওয়ায় পরিবারটি সচ্ছল হলেও বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ভাই দুজন সিঙ্গাপুরে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। ২০০১ সাল ছিল ওই পরিবারের জন্য অশুভ একটি বছর। সিঙ্গাপুরের এক দুর্ঘটনায় তাজুলের জীবন ওলটপালট হয়ে যায়। তাজুল একদিন বিশাল এক হোসপাইপের সামনে খেলতে থাকা এক মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যান। উদ্ধারকর্তা হিসেবে সাধুবাদ পাওয়ার বদলে তাঁর বিরুদ্ধে ওই মেয়েটিকে অপহরণ ও তার সাথে ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হয় এবং সিঙ্গাপুরে তাঁর তিন বছরের জেল হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর কর্মক্ষেত্রে এক দুর্ঘটনায় মাথার পেছনে লোহার রড ঢুকে তাঁর ছোট ভাই আলমের মৃত্যু ঘটে। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশে ফেরার মাত্র কয়েক মাস আগেই এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। পরিবারের সাথে নিয়মিত কথাবার্তার সময় আলম একটি টেলিভিশনসহ আরও অনেক উপহার নিয়ে আসার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ফলে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা পাওয়া ছাড়া তাঁর পরিবারের আর কোন কিছুই জোটেনি। তাজুল জেলে থাকায় তাঁর পরিবারের পক্ষে আলমের জিনিসপত্রসহ তাঁর চাকরি বীমার টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, যার পুরোটাই তাঁর সহকর্মীরা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই দুর্ঘটনায় তাঁদের পরিবারের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। আলমের মৃত্যুর ঘটনা তাঁর পিতা-মাতাকে বিধ্বস্ত করে দেয়। শোক সহ্য করতে না পেরে কয়েক মাসের মধ্যে পিতার মৃত্যু ঘটে। তাজুল ফিরে না আসা পর্যন্ত আলমের নামে পাওয়া সামান্য ক্ষতিপূরণের টাকা ও প্রতিবেশীদের কাছ

থেকে ধারদেনা করে তাজুলের স্ত্রী সংসার চালাতে থাকেন। তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েকে একই গ্রামে বসবাসরত তাঁর পিতা-মাতার কাছে পাঠিয়ে দেন। তাজুল ২০০৪ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং আর কোন দিন বিদেশ যাননি। এখন তিনি একজন দিনমজুর ও বর্গাচাষি হিসেবে কাজ করেন। পরিবারের অবস্থা এখন অভিবাসনের আগে যেমন ছিল তেমন হয়ে গেছে।

এই ঘটনাটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে দরিদ্র পরিবার তার সদস্যটিকে সব কিছু রেখে বিদেশে পাঠায়, দেশে তার নিরাপত্তার জন্য তেমন কোন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। সরকারি ক্ষতিপূরণের টাকা পেতেও সংশ্লিষ্ট দফতরে বার বার ধরনা দিতে হয়, ঘুষ দিতে হয়, যা করা ইতোমধ্যেই বিপদের মধ্যে থাকা পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিধবা স্ত্রী অনেক সময় তাঁর পুরুষ স্বজনের কাছ থেকে সাহায্য চান, কিন্তু তার জন্যও অনেক সময় প্রাপ্য টাকার একটা বড় অংশ তাঁকে দিয়ে দিতে হয়।

এই ধরনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য অভিবাসী পরিবারগুলো নানা পথ খোলা রাখে। উদাহরণস্বরূপ, ঝুমপুর গ্রাম থেকে ওমান যাওয়া প্রবাসী শ্রমিক মিলন তিন লাখ টাকা খরচ করে তাঁর বড় ছেলেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পাঠিয়েছেন। প্রতিবেশীদের সহায়তায় তিনি তাঁর মেয়ের জামাইয়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ভিসা জোগাড় করেছেন। তাঁর স্ত্রী আমাকে বলেছেন, "আল্লাহর দয়ায় আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এখন। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার ছেলে ও মেয়ের জামাই দুজনেই টাকা পাঠায়।" সারা বছর ধরে পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য এ ছাড়া মিলন কয়েক কানি জমিও কিনে রেখেছেন, যে জমি বর্গাদার অথবা কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করে চাষাবাদ করা হয়।

> আমি অনেক পরিবারকে দেনার চক্রে আটকে পড়তে দেখেছি, কারণ বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠানোর ব্যাপারটি নিয়মিত ও সুনিশ্চিত থাকে না। ঋণ পরিশোধ করার আগেই মানুষ একই বা অন্য ঋণ প্রদানকারীর কাছ থেকে ধার করে। অভিবাসী শ্রমিক দুর্ঘটনায় পড়লে, অসুস্থ হলে বা নিহত হলে তাঁর পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল পরিবারটি নিদারুণ সংকটে পড়ে যায়।

তুলনামূলক দরিদ্র পরিবারে চাষাবাদ করে হোক আর দিনমজুরি করেই হোক, গ্রামে থেকে যাওয়া নারী-পুরুষ সকলেই পারিবারিক আয়ে ভূমিকা রাখে :

আমার মাঠগবেষণার সময় সুবেদ (৩৩) ও ওবায়েদ (২৫)–দুই ভাইয়ের একজন সৌদি আরবে ও আরেকজন কাতারে ছিলেন। প্রথমে গিয়েছিলেন ওবায়েদ, যাঁর আয়ের ওপর গোটা পরিবার নির্ভর করত। আমি যখন সাক্ষাৎকার নিই পরিবারটি তখন সংকটের মধ্যে। বেশ কয়েক মাস ধরে কোন রেমিট্যান্স আসছে না, কারণ ওবায়েদের চাকরি চলে গেছে আর সুবেদ কেবল কাতারে পৌঁছেছেন। এই পরিস্থিতিতে পরিবারটি অ-অভিবাসী শ্রমিক জুনায়েদের (২১) আয়ের ওপর নির্ভর করে চলছিল। তিনি অটোরিকশা চালান। তাঁর মায়ের বিশ্বাস তাঁর দুই প্রবাসী ছেলে সময়মত ঘুরে দাঁড়াবে এবং তাঁর তৃতীয় ছেলে জুনায়েদকেও বিদেশে নিয়ে যাবে। এই পরিবারের মত আরও অনেক পরিবারেই পারস্পরিক সহযোগিতা ও আয়ের বিকল্প ব্যবস্থা প্রবাসী আয়ের অনিশ্চয়তার বিপরীতে নিরাপত্তা বিধান করছে।

দেশে ফিরে আসার পর ফের যেন দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে না হয় সে জন্য বহু অভিবাসী শ্রমিক পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরও বিদেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, যেন তাঁরা তাঁদের প্রতিস্থাপিত করে রেমিট্যান্সপ্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন। আমার সাথে এ রকম অনেক অভিবাসী শ্রমিকের কথা হয়েছে, যাঁরা তাঁদের সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে অবসরে যেতে চান।

২.৩ জমি ও পুঁজির ঝুঁকি

অভিবাসনের সময় প্রতারিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। অনেক সময় দালালরা ভুয়া ভিসা দিয়ে মানুষকে বিদেশে পাঠায়। ফিরে আসা কিছু মানুষ আমাকে বলেছেন, তাঁদেরকে ঢাকা এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা ফেরত পাঠিয়েছেন, আবার কেউ বলেছেন তাঁদের ভুয়া ভিসার ব্যাপারটি তাঁরা টের পেয়েছেন গন্তব্যে পৌঁছার পর। শুধু নতুন অভিবাসীরাই নয়, অনেক সময় অভিজ্ঞ অভিবাসীরাও এই ধরনের জালিয়াতির শিকার হন এবং ভুয়া কাগজপত্রসহ ভ্রমণ করার অপরাধে জেলে যান। দালাল নিজেও অনেক সময় চাকরি, বেতন ইত্যাদির প্রকৃত পরিস্থিতির কথা জানে না, কারণ তাকে বিদেশে থাকা অপর ব্যক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়।

উপসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দালাল ও পূর্বপরিচিতদের কাছে টাকা-পয়সা খোয়ানোর ঝুঁকিও রয়েছে। এ রকম ১২টি ঘটনার কথা আমি জেনেছি, যেসব ক্ষেত্রে অভিবাসনপ্রত্যাশী ব্যক্তি বন্ধু, স্বজন বা দালালদের কাছে বিদেশ বা ইউরোপ যাওয়ার আশায় বেশ বড় আকারের অর্থ হারিয়েছেন। কিছু ঘটনা রয়েছে, যেখানে উপসাগরীয় অঞ্চলের দালাল টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ঝুমপুরের এক অভিবাসী এভাবে সাত লাখ টাকা হারিয়েছেন। এই অর্থের একটা বড় অংশ তিনি জোগাড় করেছিলেন জমি বিক্রি করে, বাকিটা আসে বিদেশে কাজ করে জমানো টাকা থেকে। আরেকজন বলেছেন, তাঁর দেশে ফেরার সুযোগে তাঁর এক বিশ্বস্ত বাংলাদেশি বন্ধু ওমানের এক স্থানীয় ব্যক্তির কাছে তাঁর আসবাবপত্র ব্যবসার শেয়ার বেচে দিয়েছিলেন।

বিদেশে থাকা দালালদের টাকা গেলে তা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হলেও দেশের ক্ষেত্রে তা নয়। আমার মনে হয়েছে, দেশে প্রতারিত ব্যক্তি স্থানীয় সমাজপ্রধানের সহায়তায় সালিসের মাধ্যমে অনেক সময় দালালের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করার চাপ প্রয়োগ করেন। যা থেকে বোঝা যায়, অভিবাসীদের এক ধরনের স্থানীয় সুরক্ষাজাল রয়েছে। মানুষ খুব কম ক্ষেত্রেই দালালের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে পুলিশের কাছে যায় বা মামলা দায়ের করে। কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্র ছাড়াই টাকা লেনদেন হওয়ায় দালালের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন। তা ছাড়া দালাল পুলিশকে ঘুষ দিয়েও ছাড়া পেয়ে যেতে পারে।

এই সব বিবেচনায় গ্রাম্য সালিসই সুবিধাজনক। কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষের আহ্বানে এলাকার নেতা ও মুরব্বিরা সালিসে বসেন এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে মৌখিক রায় প্রদান করেন। সালিসের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কোন আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও একঘরে ও লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে সকলেই সালিসকে বেশ গুরুত্বের সাথে নেন। আমার আসার আগে দুজন দালাল তাদের পরিবার নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়েছে, কারণ সালিসে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে অর্থ ফেরত দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

যদিও সিদ্ধান্ত অনেক সময় বিতর্কিত হয় এবং প্রায়শই ধনী ও ক্ষমতাবানের পক্ষে যায়, তবু দালাল ও অভিবাসনপ্রত্যাশী যদি একই গ্রামের বাসিন্দা হয় তাহলে দালালকে শায়েস্তা করার সুযোগ অনেক সময় পাওয়া যায়। মোশারফ তাঁর স্ত্রীর গ্রামের দালালের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীর খালাত ভাই ছিলেন স্থানীয়

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি দালালের ওপর টাকা ফেরত দেয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দালাল আংশিক বা পুরো টাকা ফেরত প্রদান করে অথবা ভিন্ন গন্তব্যে প্রেরণ করে। অনেক সময় পরিবারের অন্য কোন সদস্যকে বিদেশে পাঠিয়েও দালাল ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। এভাবে সমাজ ও সালিস থেকে উদ্ভূত সামাজিক পুঁজি অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিমা।

অবশ্য অন্য আরও অনেক কাহিনি রয়েছে যখন আত্মীয়তার সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে অভিবাসন করতে গিয়ে আর্থিক পুঁজির বদলে সামাজিক পুঁজি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। মবিনের ঘটনা থেকে তা সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়।

২.৪ সামাজিক পুঁজি হারানোর ঝুঁকি

মবিন (৫০) তিন বোনের একমাত্র ভাই। তিনি ঝুমপুর গ্রামের একেবারে প্রথম দিককার অভিবাসী, যাঁরা ১৯৮০-র দশকে মধ্যপ্রাচ্য গমন করেন। তিনি পাইপ ফিটার (প্লাম্বার) হিসেবে কাজ করেছেন ইরাক (১৯৮০-৮২), সৌদি আরব (১৯৮৩-১৯৯০), সিঙ্গাপুর (১৯৯০-৯১) ও কুয়েতে (১৯৯৭-২০০৫)। তাঁর পরিবারের সাথে স্ত্রীর তেমন বনিবনা ছিল না, ফলে মবিন বিদেশে থাকা অবস্থায় তিনি ঝুমপুরে থাকেননি। তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর অবহেলা নিয়ে পিতা-মাতা তাঁদের ওপর বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর পিতা মারা যান ১৯৯৭ সালে। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মবিনের মা ও বোনদের দিয়ে যান, মবিনের জন্য ছিল কেবল ভিটার জমিটুকু। এর ফলে মবিনের সাথে তাঁর মা ও বোনদের তীব্র মনোমালিন্য তৈরি হয়। মবিনের কনিষ্ঠ বোন শিমু তাঁর নানাবাড়িতে চলে যান তাঁর মায়ের দেখভাল করার জন্য। মবিনের পিতা কেন মবিনকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন–আমার এই প্রশ্নের জবাবে শিমু জানালেন, "এর পেছনে লম্বা ইতিহাস রয়েছে। ১৯৯০ সালের কথা। আমরা শুনলাম বিদেশ পাঠানোর কথা বলে আমার ভাই অনেক মানুষের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছেন, কিন্তু বিদেশে পাঠাতে পারেননি। লোকের হামলা থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা তাঁকে চট্টগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম। আমরা তাঁর জন্য কিছু একটা করতে চাইলাম, কারণ তাঁর পরিবারও কষ্ট করছে। আমি সিঙ্গাপুরে থাকা আমার স্বামীকে ভাইয়ের জন্য ভিসা পাঠাতে বললাম। তিনি প্রথমে রাজি না হলেও বার বার অনুরোধ করার পর রাজি হলেন। মবিন সিঙ্গাপুরে গেলেন, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়ার কারণ দেখিয়ে তিন মাসের মধ্যেই ফিরে এলেন। তাঁর ওয়ার্ক পারমিটের বৈধতা বজায় রাখার জন্য আমার স্বামী ক্ষতিপূরণ হিসেবে সিঙ্গাপুর সরকারকে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করলেন। তিনি মনে করেছিলেন, আমার ভাই দ্রুতই সেই টাকা তাঁকে পরিশোধ করে দেবেন। মবিন দুই মাস পর সিঙ্গাপুর গেলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে সেই টাকাটা ফেরত দিলেন না। দুই মাস সিঙ্গাপুরে থাকার পর তিনি আবার দেশে ফিরে এলেন। আমি তাঁকে আর দেশে ফিরতে নিষেধ করলাম, কারণ মানুষের কাছ থেকে নেয়া টাকা ফেরত না দেয়ার কারণে তাঁর জীবন তখনও ঝুঁকির মধ্যে। কিন্তু তিনি বললেন, তাঁর স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে। একদিন সকালে হঠাৎ আমরা জানতে পারলাম তিনি কুয়েত চলে গেছেন। এবারের টাকাটা তিনি জোগাড় করেছেন তিন কানি (০.৯ একর) জমি বিক্রি করে, যা তিনি তাঁর রেমিট্যান্সের টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিলেন।"

মবিনের সাথে আমার দেখা হয় ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে, যখন তিনি কুয়েত থেকে ফিরে এসেছেন। মনে হচ্ছিল পারিবারিক সমস্যায় তিনি বিধ্বস্ত। তিনি বললেন, "আপনি কখনও এমন সন্তানকে দেখেছেন, যাকে তার পিতা-মাতা ভালবাসে না? আমি এ রকমই এক দুর্ভাগা সন্তান। আমার মা আমাকে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমার পিতা আমাকে কিছুই দেবেন না, এটা আমি বিশ্বাস করি না। সবই আমার বোনদের পরিকল্পনায় হয়েছে। আমি শিগগিরই এ বিষয়ে সালিস ডাকব।" তাঁর মা বলেন, "সে আমার একমাত্র পুত্র। কিন্তু সে বা তার স্ত্রী কোন দিন আমার কোন খোঁজখবর নেয়নি। পিতার সম্পত্তির ওপর তার লোভ দীর্ঘদিনের। আমাদের চার একরের বেশি জমি ছিল। তার প্রথমবার বিদেশ যাওয়ার সময় আমার স্বামী এক কানি (০.৩ একর) জমি বিক্রি করেছিলেন। পর্যায়ক্রমে আরও অনেক জমি বিক্রি করতে সে বাধ্য করে, কিন্তু বিনিময়ে কোন কিছুই আমাদেরকে দেয়নি। তার এই আচরণের কারণে আমার স্বামী এতটাই আঘাত পেয়েছিলেন যে তিনি মৃত্যুশয্যায় একটুকরো জমিও মবিনকে দিয়ে যেতে চাননি।"

আমি গ্রামে থাকা অবস্থায়ই দুইবার সালিস ডাকা হয়েছিল, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক একবারও তা অনুষ্ঠিত হয়নি। মবিন গ্রামেই ছিলেন এবং মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করছিলেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, অভিবাসী যখন দালাল হিসেবে আদম ব্যবসায় নিয়োজিত হয়, তখন অভিবাসন ঝুঁকিবহুল হয়ে যায়। প্রথমত, সরকারি অনুমোদন ছাড়া বিদেশে মানুষ পাঠানো অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়। সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হওয়াসহ জীবনের নিরাপত্তা এমন হুমকির মধ্যে পড়তে পারে যে ওই অভিবাসী ব্যক্তিকে নিজ গ্রাম থেকে পালাতে হতে পারে; যেমনটি ঘটেছে ওপরে উল্লিখিত দালাল দুজনের ক্ষেত্রে। সর্বোপরি, অর্থ পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবারের ওপরও প্রবল চাপ পড়ে, যার ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ তৈরি হয়। সুতরাং অভিবাসনের মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থিক পুঁজি যেমন বাড়তে পারে, তেমনি ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে। সামাজিক পুঁজি হারানোর ঝুঁকির সাথে ঋণগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি যুক্ত থাকে। ব্যর্থ অভিবাসনের ফলে যে কেবল শেষ সম্বল জমিটুকুই হারাতে হয় তা নয়, সেই সাথে ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতাও নষ্ট হয়।

৩. ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্য

ব্যর্থ অভিবাসনের কথা বলতে গিয়ে মনপুর ও ঝুমপুর গ্রামের মানুষ যে কথাটা ব্যবহার করে তা হল 'মার খাওয়া'। অভিবাসনের ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, সামাজিক ও মানসিক ক্ষতি ইত্যাদি বহু ধরনের পরিস্থিতি বোঝাতে 'মার খাওয়া' কথাটি ব্যবহৃত হয়। আমার অভিজ্ঞতায় ব্যর্থ অভিবাসন বলতে নিম্নোক্ত পরিস্থিতিগুলোকে বোঝায় :

* দালাল কর্তৃক টাকা মেরে দেয়া এবং পুঁজি হারানো
* দালালরা টাকা ফেরত দিলেও বিদেশে পাঠাতে না পারা
* বিদেশে যেতে পারলেও দেশে পর্যাপ্ত অর্থ পাঠাতে না পারা
* বিদেশে গিয়ে অর্থ আয় করা এবং দেশে পর্যাপ্ত অর্থ পাঠাতে পারলেও সব শেষে খালি হাতে কোন সঞ্চয় ছাড়াই দেশে ফেরা
* কোন লাভ করার আগেই দেশে ফিরতে বাধ্য হওয়া

ওপরের ঘটনাগুলো থেকে দেখা যায়, অভিবাসী ও তার পরিবার অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে– যাত্রা শুরুর আগে, যাত্রার সময় এবং যাত্রার পর– নানাভাবে ব্যর্থ হতে পারে। জাহানের ঘটনা থেকে আমরা ব্যর্থতার পাঁচ ধরনের কারণ শনাক্ত করতে পারি : পাসপোর্ট জালিয়াতি, নিম্ন মজুরি, চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, অবৈধ প্রবেশ এবং অবৈধ কারবারে যুক্ত হওয়া। এ ছাড়া মানুষ হঠাৎ বেকারত্ব, মারাত্মক দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, নিপীড়ন ও শোষণের কথাও উল্লেখ করে (টেবিল-১ দ্রষ্টব্য)।

এখন আমি আলোচনা করব অভিবাসনের ব্যর্থতাকে ভাগ্যের দোষ

বলে চিহ্নিত করে মানুষ কী করে মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখে। আমি দেখাতে চাই, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করার সংস্কৃতির ওপর ভর করে মানুষ কেমন করে ব্যর্থতাকে মেনে নেয় এবং যে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়, তা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে।

টেবিল ১ : মনপুর ও ঝুমপুর গ্রামের ব্যর্থ অভিবাসন

ব্যর্থতার উৎস	ব্যর্থতার সংখ্যা
দালাল/আত্মীয়-স্বজন/বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক টাকা মেরে দেয়া এবং বিদেশে পুঁজি হারানো	১২
আংশিক বা সম্পূর্ণ টাকা ফেরত পেলেও বিদেশ যেতে না পারা	২১
চাকরি না পাওয়া/নিম্ন মজুরি/মজুরি না পাওয়ার কারণে দেশে পর্যাপ্ত অর্থ পাঠাতে না পারা	১৩
অনুপ্রবেশ বা অবৈধভাবে থাকার অপরাধে দেশে ফেরত পাঠানো	৮
অভিবাসন ব্যবসায় সঞ্চয় হারানো	৩
অসুস্থতা/দুর্ঘটনা/নিপীড়ন/প্রতিষ্ঠান বন্ধ ইত্যাদি কারণে খালি হাতে কোন সঞ্চয় ছাড়াই দেশে ফেরা	১১
সর্বমোট	৬৮

আমার গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, অভিবাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা, বিশেষত মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মত ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা হিসেবে সাধারণত ভাগ্য এবং/অথবা কপালের দোষের কথা বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন উপলক্ষে মানুষ আমার কাছে বলেছে, "বিদেশের ব্যাপারটা পুরোপুরি ভাগ্যের বিষয়।" অসুস্থতা, দুর্ঘটনা কিংবা হঠাৎ দেশে ফেরত পাঠানোর কারণে যেসব অভিবাসী তাঁদের মেয়াদ পুরো করতে পারেন না তাঁরাই সাধারণত পুরো বিষয়টার জন্য তাঁদের কপালকে দায়ী করেন।

দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে থাকার সময় আমি মানুষকে বিভিন্ন সময় বলতে শুনেছি : 'কপালে খারাপ থাকলে কি আর করুম' অথবা 'ভাগ্যে থাকলে কিছু করার নাই'। মজার ব্যাপার হল, এই মানুষগুলোই কিন্তু টানা ব্যর্থতার পরও বার বার চেষ্টা করতেই থাকেন। ফলে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসে : তারা কি অদৃষ্টবাদী? যদি তা-ই হয়, তাহলে কেন বার বার চেষ্টা করতে থাকেন? 'কপাল' কি তাহলে ঝুঁকি ও ব্যর্থতা সামাল দেয়ার একটা হাতিয়ার? মানুষ কোথা থেকে আশা পায়? এখন আমি মনোবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে ভাগ্য ও আশাবাদ নিয়ে যে পর্যালোচনা করা হয়েছে তার সাহায্যে ব্যর্থ অভিবাসন সম্পর্কে গ্রামবাসীর আচরণ ও মনোভাব বোঝার চেষ্টা করব।

অদৃষ্টবাদিতা হল এমন একটা বিশ্বাস, যা মনে করে– কিছু ঘটনা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরের অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা আসলে ঘটবেই, কোনভাবেই যার কোন পরিবর্তন করা যাবে না। মনোবিদরা ভাগ্যের বিশ্বাসের সাথে আত্মনিয়ন্ত্রণে দুর্বলতারবোধের সম্পর্ক খুঁজে পান। তাঁরা মনে করেন, ফলাফলের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকলে মানুষের আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতারবোধ ও নিজ যোগ্যতা সম্পর্কে আস্থা বাড়ে। মনপুর ও ঝুমপুরের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, অভিবাসনের ঘটনায় অভিবাসন প্রত্যাশীদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকে প্রতিটি পর্যায়েই অভিবাসন প্রত্যাশীকে ধারাবাহিক কতগুলো কার্য সম্পাদনের জন্য অন্যদের ওপর নির্ভর করতে হয়, যেগুলো সম্পন্ন হওয়ার আবার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। যেমন– বেশির ভাগ অভিবাসীরই নিজেদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ থাকে না, এই অর্থ জোগাড় করার জন্য তাঁদেরকে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। অর্থ জোগাড় হওয়ার পর অভিবাসনপ্রত্যাশী ব্যক্তিকে এবার ভিসার জন্য দালাল, আত্মীয়-স্বজনসহ অন্যদের ওপর নির্ভর করতে হয়। একমাত্র যে বিষয়টি অভিবাসী নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে পারেন তা হল তাঁর সামাজিক পুঁজি। এ কারণেই আমার মনে হয়েছে, অভিবাসীদের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করার প্রবণতার জন্য আসলে অভিবাসন প্রক্রিয়ার ওপর তাঁদের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার ব্যাপারটি অনেকাংশে দায়ী।

নয়াদিল্লি, ঢাকা ও ইসলামাবাদের গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসীদের ওপর একদল মনোবিদের করা এক তুলনামূলক গবেষণা থেকে দেখা গেছে, ভাগ্যকে মেনে নেয়ার ব্যাপারটি শুধু মানসিক যন্ত্রণা লাঘব ও কাজের ফলাফলের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ না থাকার অনুভূতিই নয়, সেই সাথে দারিদ্র্য ও ধর্মের সাথেও সম্পর্কিত। ঢাকার অভিবাসীরা তাঁদের অভিবাসনের কারণ হিসেবে গ্রামে কাজের সুযোগের অভাব ও ভাগ্যের কথা বলেছেন আর নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের অভিবাসীরা জানিয়েছেন বেকারত্ব, পারিবারিক সমস্যা, গ্রামীণ শোষণ এবং সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন ঘটানোর আকাঙ্ক্ষার কথা। ঢাকা ও ইসলামাবাদের অভিবাসীরা বেশির ভাগ মুসলমান এবং দিল্লির অভিবাসীরা বেশির ভাগ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। গবেষকদের কাছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভাগ্যের ওপর বেশি বিশ্বাসী মনে হয়েছে, কারণ ইসলাম ধর্ম মতে ব্যর্থতা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায় ঘটনা ও তার ভাল-মন্দ সব কিছু আল্লাহ আগেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বাংলাদেশের গ্রামে পরিচালিত একই ধরনের আরও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকেও দেখা গেছে, গ্রামের মানুষ নিজেদের কর্মের ফলাফলের তুলনায় ভাগ্য ও নৈতিক অনুশাসনের ওপর বেশি বিশ্বাস করেন। মনপুর ও ঝুমপুর গ্রামের দৃষ্টান্তও এর চেয়ে খুব বেশি আলাদা কিছু নয়। আমার পর্যবেক্ষণ হল, নিজেদের জীবনের ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে– এ রকম একটা বিশ্বাস মানুষের ঠিকই রয়েছে, কিন্তু সেই সাথে তাঁরা এটাও বিশ্বাস করেন যে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তাঁরা খুব বেশিদূর এগোতে পারবেন না। 'সবই তাঁর ইচ্ছা', 'তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না' ইত্যাদি কথার মধ্য দিয়ে তাঁরা ব্যর্থতা মেনে নেন, তারপর আবার সামনে এগোনোর চেষ্টা করেন।

সমাজতাত্ত্বিকরা অদৃষ্টবাদকে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বঞ্চনার ফলাফল হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। গবেষকরা দেখিয়েছেন, বৈষম্যের মত কাঠামোগত শর্ত কিংবা চরম নিয়ন্ত্রণের পরিবেশ থেকেও অদৃষ্টবাদের জন্ম হতে পারে। তা ছাড়া সমাজে ঝুঁকি সমভাবে বণ্টিত হয় না, সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মানুষকেই বেশির ভাগ ঝুঁকি বহন করতে হয়। ফলে এটা বলা যেতেই পারে যে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশের মানুষকে চলমান নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেই বসবাস করতে হয়, আর 'সবই আল্লাহর ইচ্ছা'– মানুষের এই ধরনের মনোভাবের কারণও এই নিরাপত্তাহীনতার বোধ। এর অর্থ হল, সমাজের দরিদ্রতর অংশের অভিবাসীদের কাছে অভিবাসনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য খুব বেশি কিছু থাকে না, একমাত্র ভাগ্যের ওপরই তাঁরা নির্ভর করতে পারেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি আরেকটু জটিল। মানুষ ভাগ্যের ওপর বিশ্বাস করার কথা বললেও আমি তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে একটা স্ববিরোধ বা প্যারাডক্স লক্ষ করেছি। ভাগ্যের ওপর বিশ্বাসের কথা বললেও বাস্তবে তাঁরা মধ্যপ্রাচ্য বা অন্য কোন শ্রমবাজারে গমনের কোন প্রচেষ্টাই বাদ রাখেন না, এমনকি নিজের শেষ সম্বল হারানো সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটিও আশা ছাড়েন না।